তারিখ ... 6 FEB 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ২৪ ...

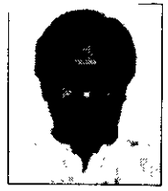

রেজানুর রহমান ▷

কে কার পিঠে চড়বে?

যুগ কি সত্যি সত্যি পাল্টে গেল? শিক্ষক আর জনপ্রতিনিধিরা কি সত্যি সত্যি প্রভু হয়ে গেলেন? তা নাহলে কোন যুক্তিতে একজন জনপ্রতিনিধি কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের পিঠে জুতাসহ হেঁটে যান? এলাকার জনপ্রতিনিধি মানেই তো সেই এলাকার আইডল। ছোটবেলায় এলাকার একজন মেম্বারকে দেখে (এখন যাঁদের কমিশনার বলা হয়) তাঁর মতো হতে চেয়েছিলাম। থানা পর্যায়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার বক্তৃতা শুনে ভেবেছিলাম তাঁর মতো হব। তখনকার দিনের থানা এখনকার উপজেলা। ধরা যাক এখনকার ছেলে-মেয়েরা একজন উপজেলা চেয়ারম্যানের মতো হতে চায়। বোধকরি তাদের স্বপ্নটা আমার ছোটবেলার স্বপ্নের চেয়ে অনেক দামি

প্রিয় পাঠক,

আজ আপনাদের কাছে আমার প্রিয় তিনজন শিক্ষকের কথা বলব। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন আমার বাবা। অনেকে হয়তো বলতে পারেন, আপনার বাবার কথা আমরা শুনব কেন? তিনি কি দেশের রাষ্ট্রপতি ছিলেন, নাকি প্রধানমন্ত্রী? আর আপনিই বা কে যে আপনার বাবার কথা শুনতে হবে? সবার উদ্দেশে বিনীত শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, আমি আসলে আমার বাবার কথা বলছি না, একজন শিক্ষকের কথা বলছি। তাঁর নাম নূর বকস মণ্ডল। উত্তর জনপদে রেলের শহর সৈয়দপুরে সাব-অর্ডিনেট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন তিনি। আমরা ভাই-বোনেরা তখন অনেক ছোট। বাবাকে দেখতাম প্রায়ই অনেক রাত করে বাসায় ফিরতেন। এ জন্য আমাদের মমতাময়ী মা বাবাকে মাঝেমধ্যেই মৃদু ভর্ৎসনা করতেন। একদিন বেশ রাত হয়েছে। বাবা বাসায় ফেরেননি। বাসার বারান্দায় মা অস্থির পায়চারি করছেন। গভীর রাতে বাবা বাসায় ফিরলেন। মা রেগে অস্থির। বাবাকে কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করালেন। প্রতিদিন এত রাত করে বাসায় ফেরো কেন? রাতে কী করো তুমি? আজ তোমাকে সব বলতেই হবে। কথা বলছ না কেন?

বাবা নিশ্চুপ ভঙ্গিমায় মায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, বেনু (আমার মায়ের ডাক নাম), আমি খুব ক্লান্ত। ঘুমাব। কাল সকালে তোমার সঙ্গে কথা হবে। বাবা রাতের খাবার খেলেন না। কারো সঙ্গে কথাও বললেন না। হাত-মুখ ধুয়ে ঘুমাতে গেলেন। কিন্তু আমাদের মা প্রায় সারা রাত জেগে রইলেন। পরের দিন সকালবেলা আমাদের বাসার সদর দরজায় খটখট শব্দ শুনে সবার ঘুম ভেঙে গেল। দরজা খুলতেই দেখা গেল এক ভদ্রলোক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাদের মা দরজা খুলে দিয়েছিলেন। ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিয়ে জানতে চাইলেন—স্যার কি বাসায় আছেন?

মা বললেন—হ্যাঁ, উনি তো ঘুমাচ্ছেন। গত রাতে অনেক দেরিতে বাসায় ফিরেছেন...ভদ্রলোক মায়ের কথা টেনে নিয়ে বললেন—হ্যাঁ, আমি জানি। গত রাতে তিনি আমাদের সঙ্গেই ছিলেন। রাতে হঠাৎ করে আমার ছোট মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাকে হাসপাতালে নিতে হয়েছিল। স্যার না থাকলে আমরা সত্যি সত্যি বিপদে পড়ে যেতাম। ভদ্রলোকের কথা শুনে মা একটু নরম হলেন। তাঁকে ড্রয়িংরুমে এনে বসালেন। ভদ্রলোকের মুখেই শুনলাম আমাদের বাবা প্রতি রাতে কোথায় যান, কী করেন। ভদ্রলোক মাকে জিজ্ঞেস করলেন—আপা, আপনারা কি জানেন মণ্ডল স্যার প্রায় রাতে কোথায় যান, কী করেন?

মা বললেন—না, আমরা জানি না। ভদ্রলোক রীতিমতো একটা ইতিহাস তুলে ধরলেন। মণ্ডল স্যার প্রায় প্রতি রাতে তাঁর স্কুলের গরিব ছাত্রছাত্রীদের বাসায় যান তাদের লেখাপড়া কেমন হচ্ছে তা দেখার জন্য। এমনও হয় কোনো ছাত্র বা ছাত্রীর বাসায় গিয়ে দেখলেন সে অঙ্ক বুঝতে পারছে না। ব্যস, বসে গেলেন তাকে অঙ্ক বোঝাতে। এভাবে বোঝাতে গিয়ে রাতের কথা খেয়াল থাকে না।

ভদ্রলোক সৈয়দপুর রেল কারখানার মধ্যম স্তরের কর্মচারী ছিলেন। তাঁর চার ছেলে-মেয়ে। সবাই স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী। ছোট মেয়েটি খুব মেধাবী। প্রাইভেট পড়ালে হয়তো বৃত্তি পেতে পারে। অথচ তাঁর আর্থিক সামর্থ্য নেই। আমাদের প্রিয় বাবাই তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন—ভাই, আপনি চিন্তা করবেন না। আমিই আপনার মেয়েকে প্রাইভেট পড়াব। এ জন্য টাকা দিতে হবে না।

বাবা গত রাতে ভদ্রলোকের ছোট মেয়েকে প্রাইভেট পড়াতে গিয়েছিলেন। মেয়েটি নাকি প্রায়ই শ্বাসকষ্টে ভুগত। ওই রাতে তার শ্বাসকষ্ট বাড়ে। তাই দেখে আমাদের বাবা হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে তাকে নিয়ে সৈয়দপুর রেলওয়ে হাসপাতালে যান। মেয়েটিকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। আমাদের বাবা রাতে হাসপাতাল থেকে আসতে চাননি। তাঁকে জোর করে বাসায় পাঠানো হয়। মেয়েটি এখন সুস্থ হয়ে উঠেছে। সে কথা জানানোর জন্যই ভদ্রলোক এত সকালে আমাদের বাসায় এসেছেন।

দুই.

এবার আমার আরেকজন প্রিয় শিক্ষকের কথা বলি। তাঁর নাম আহাদুজ্জামান মোহাম্মদ আলী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে ভর্তি হয়েছি। মফস্বল শহর থেকে রাজধানীতে এসেছি। অনেক কিছুই বুঝি না। একদিন আহাদ স্যারকে সব কিছু খুলে বললাম। সেদিন থেকে তিনি শুধু একজন শিক্ষক নন, আমার বাবার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া অবস্থায় আমি দৈনিক ইত্তেফাকে বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার হিসেবে কাজ করার সুযোগ পাই। আহাদ স্যার খবরটা শুনে বুকে জড়িয়ে নিয়ে বলেছিলেন—হ্যাঁ, এবার তুমি ঠিক রাস্তা পেয়েছ...বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় একবার আমি জন্ডিসে আক্রান্ত হয়েছিলাম। কঠিন পর্যায়ে গিয়েছিল রোগটা। যা খাই তাই বমি করি। বন্ধুরা ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করায়। প্রায় এক মাস হাসপাতালে থাকতে হয়েছে সেবার। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বন্ধুদের অনেকে আমাকে দেখতে আসে। একদিন বিকেলে হাসপাতালের বেডে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ চোখ মেলে দেখি আমার প্রিয় শিক্ষক আহাদুজ্জামান মোহাম্মদ আলী মাথা নিচু করে আমার বিছানার পাশে নিশ্চুপ বসে আছেন। আমি বিস্মিত। ঘটনা কী সত্যি! বিছানা থেকে উঠে বসতে গিয়ে বুঝলাম ঘটনা সত্যি। আহাদ স্যার না-না করে উঠলেন। উঠো না। ঘুমাও...

জানতে চাইলাম—স্যার, কখন এসেছেন। স্যার ঘড়ি দেখে বললেন—প্রায় আধাঘণ্টা...

অবাক হয়ে বললাম—আপনি আধাঘণ্টা ধরে এভাবে বসে আছেন?

স্যার তাঁর মুখে স্বভাবসুলভ মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে বললেন—তুমি ঘুমাচ্ছিলে...ভাবলাম ডাক দিলে তোমার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে। তাই...

আহাদ স্যারকে সেদিন সত্যি সত্যি আমার বাবাই মনে হয়েছিল। আমার মতো একজন সাধারণ মানের ছাত্রের অসুস্থতায় যে শিক্ষক বিচলিত হন তিনি তো আসলে শুধু শিক্ষক নন; তিনি আমার কাছে দেবতা। তিনি আমার বাবাও বটে!

তিন.

এবার আরেকজন প্রিয় শিক্ষকের কথা বলি। তাঁর নাম রাজেন্দ্রনাথ বিএসসি। কুড়িগ্রাম জেলা শহরের অদূরে দুর্গাপুর হাই স্কুলের অঙ্কের শিক্ষক ছিলেন। ১৯৭১ সালে দেশে মহান স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু হলে আমরা সৈয়দপুর শহর ছেড়ে পালিয়ে গ্রামের বাড়িতে চলে আসি। স্বাধীনতার পর সহসা শহরে ফিরে যাওয়ার সুযোগ হচ্ছিল না। তাই ভর্তি হলাম গ্রামের স্কুলে, দুর্গাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে। বীজগণিত বুঝি না। গসাগু, লসাগু মাথায় ঢোকে না। হঠাৎ একদিন রাজেন স্যার জিজ্ঞেস করলেন—এই ছেলে, তুমি থাকো কোথায়? উত্তরে বললাম—প্রায় পাঁচ মাইল দূরের গ্রামে। তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন—প্রতিদিন স্কুল শুরুর আগে সকালে তুমি আমার বাড়িতে আসতে পারবে? উত্তরে বললাম—হ্যাঁ, পারব। স্যার আদেশের ভঙ্গিতে বললেন— কাল থেকে তুমি রোজ সকালে আমার বাড়িতে আসবে। আমরা একসঙ্গে সকালের নাশতা করব। তারপর অঙ্ক শিখব।

রাজেন স্যার আমাকে বীজগণিত শিখিয়েছেন। গসাগু, লসাগু বুঝিয়েছেন। একবার বেশ বড় বন্যা হয়েছিল। বাঁশের সাঁকো পার হতে হবে। আমি ভয়ে অস্থির। রাজেন স্যার অভয় দিয়ে বললেন—এক কাজ করো, তুমি আমার পিঠে উঠো...

অবাক হয়ে বললাম—স্যার একি বলছেন আপনি? আমি আপনার পিঠে উঠব? আমার পা তো আপনার শরীরে লেগে যাবে...আমি পারব না।

স্যার জোর করে কাছে টেনে নিয়ে বললেন—আরে বোকা, শিক্ষক তো বাবার মতো। আমি রোজ এই সাঁকো পার হই। আমি জানি কিভাবে সাঁকো পার হতে হয়। উঠো আমার পিঠে, উঠো... না, সেদিন আমি স্যারের কথা রাখিনি। তবে স্যারের হাত ধরে সাঁকো পার হওয়া শিখেছি।

চার.

যুগ কি সত্যি সত্যি পাল্টে গেল? শিক্ষক আর জনপ্রতিনিধিরা কি সত্যি সত্যি প্রভু হয়ে গেলেন? তা না হলে কোন যুক্তিতে একজন জনপ্রতিনিধি কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের পিঠে জুতাসহ হেঁটে যান? এলাকার জনপ্রতিনিধি মানেই তো সেই এলাকার আইডল। ছোটবেলায় এলাকার একজন মেম্বারকে দেখে (এখন যাঁদের কমিশনার বলা হয়) তাঁর মতো হতে চেয়েছিলাম। থানা পর্যায়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার বক্তৃতা শুনে ভেবেছিলাম তাঁর মতো হব। তখনকার দিনের থানা এখনকার উপজেলা। ধরা যাক, এখনকার ছেলে-মেয়েরা একজন উপজেলা চেয়ারম্যানের মতো হতে চায়। বোধকরি তাদের স্বপ্নটা আমার ছোটবেলার স্বপ্নের চেয়ে অনেক দামি। কারণ তারা উপজেলা চেয়ারম্যান হলে কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের পিঠের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারবে।

লেখাটা শেষ করি। কিন্তু এই লেখার মাজেজা কী? কেনই বা আমার প্রিয় শিক্ষকদের কথা বললাম। এর পেছনে একটা কারণ অবশ্যই আছে। সেটা হলো শিক্ষক-ছাত্রের মধুর সম্পর্কের কথা তুলে ধরা। কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের পিঠের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া ৮০ কেজি ওজনের এক উপজেলা চেয়ারম্যানের পক্ষে সাফাই গাইতে দেখলাম একজন শিক্ষককে। তিনি বলেছেন, রাস্তা ভাঙা। একটা ব্রিজ দরকার। সেটা দেখানোর জন্য স্কুলের স্কাউটরা নিজেদের পিঠ দিয়ে রাস্তা বানিয়েছে। সেই ব্রিজ দিয়ে হেঁটেছেন এলাকার জনপ্রতিনিধি।

কী মূর্খের মতো কথা। এই শিক্ষকের কী একবারও মনে হলো না, এর ফলে কোমলমতি শিশুরা শরীরে ব্যথা পাবে, তাদের কষ্ট হবে? আমার শিক্ষকরা ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন। সে জন্য ছাত্রকেই পিঠে নিতে চেয়েছিলেন। আর এখন শিক্ষকরাই ছাত্রের পিঠে চড়ে। বাহ! কী চমৎকার!

লেখক : নাট্যকার, সাংবাদিক